BNG-A-CC-2
মডিউল-৩

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

রাষ্ট্রশাসন পরিচালনের জন্য ইংরেজ সিভিলিয়ানদের এ দেশের ভাষা শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে কোম্পানি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন। কোমপানির উদ্দেশ্যের মধ্যে রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না ।কিন্তু ইতিহাসের রথচক্র কোনো শাসকের প্রয়োজনকেই খাতির করে না । তাই এর কার্যকলাপ কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না । বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যাকে আমরা আধুনিক যুগের সূচনা বলে অভিহিত করে থাকি ।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ প্রোভোস্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন রেভা .ডেভিড ব্রাউন। ১৮০১-এ অধ্যক্ষ ও বিভাগীয় প্রধান হন (বাংলা ও সংস্কৃত) রেভা . উইলিয়ম কেরী এবং ১৮৩৪ খ্রি . পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । পরবর্তীতে বাংলা ও সংস্কৃত বিষয়ের প্রধান পন্ডিত নিযুক্ত হন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

১৮৫৪ খ্রি . পর্যন্তেই কলেজটি তার উদ্দেশ্য পালন করে গিয়েছে । কিন্তু ১৮১৫ সালের পরে তার ইতিহাস গুরুত্ব হারিয়েছে । ১৮০১ - ১৮১৫ পর্যন্ত এই কলেজ বাংলা গদ্য সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করে এদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে । ১৮১৫ সালের পর রামমোহনের আবির্ভাবে এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাইরেও নানাবিধ প্রতিষ্ঠান গদ্য- সাহিত্যের দায়িত্ব গ্রহণ করায় ভারকেন্দ্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে সরে গেল । অথচ বাংলায় গদ্যসাহিত্য রচনা করা এই কলেজের লক্ষ্যে ছিল না , ছিল উপলক্ষ মাত্র। এই উপলক্ষই কিন্তু কলেজটিকে ইতিহাসের বুকে মর্যাদা দিয়েছে ।

এক্ষেত্রে আমাদের সর্বাগ্রেই উইলিয়ম কেরীর কথা স্মরণ করতে হয় । তিনি ইতিপূর্বেই গদ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বাইবেলের অনুবাদ প্রসঙ্গে। আর বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে অনুভব করেন গদ্য- গ্রন্থের অভাব। তিনি যেসব পন্ডিত ও মুনসিকে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁদের সাহায্যে নিজে যেমন গদ্যগ্রন্থ সঙ্কলনের কাজে হাত দিলেন , তেমনি তাঁদের স্বাধীনভাবে গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করতে লাগলেন ।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান তিনজন হলেন - কেরী , প্রধান পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কেরীর প্রাক্তণ মুনসি রামরাম বসু । আর অন্যান্য পন্ডিতেরা হলেন - গোলকনাথ শর্মা , তারিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চন্ডীচরণ মুনসী , রামকিশোর তর্কচূড়ামণি , মোহনপ্রসাদ ঠাকুর , হরপ্রসাদ রায় ।

ফোর্ট উইলিয়ম লেখকগোষ্ঠী দ্বারা প্রকাশিত গ্রন্থগুলির একটি তালিকা প্রকাশ কালানুযায়ী নিম্নে দেওয়া হলো -

নং	গ্রন্থ	লেখক	প্রকাশকাল
১	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	রামরাম বসু	১৮০১
২	কথোপকথন	উইলিয়ম কেরী	১৮০১
৩	হিতোপদেশ	গোলকনাথ শর্মা	১৮০২
৪	বত্রিশ সিংহাসন	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	১৮০২

৫	লিপিমালা	রামরাম বসু	১৮০২
৬	ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট	তারিণীচরণ মিত্র	১৮০৩
৭	মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্	রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	১৮০৫
৮	তোতা ইতিহাস	চন্ডীচরণ মুন্সী	১৮০৫
নং	গ্রন্থ	লেখক	প্রকাশকাল
৯	হিতোপদেশ	রামকিশোর তর্কচূড়ামণি	১৮০৮
১০	হিতোপদেশ	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	১৮০৮
১১	রাজাবলি	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	১৮০৮
১২	ইংরাজী- বাংলা শব্দকোষ	মোহনপ্রসাদ ঠাকুর	১৮১০
১৩	ইতিহাসমালা	উইলিয়ম কেরী	১৮১২
১৪	প্রবোধচন্দ্রিকা	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	১৮১৩ (পরে প্রকাশিত)
১৫	পুরুষপরীক্ষা	হরপ্রসাদ রায়	১৮১৫

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখক গোষ্ঠীর দশজনের মধ্যে তিনজনের অবদান অনস্বীকার্য। আমরা এই স্মরণীয় ও বরেণ্য লেখক ত্রয়ী সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে বিস্তারিত আলোচনা করব।

উইলিয়ম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪)

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে কেরী সাহেবের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।শ্রীরামপুর মিশন থেকে কেরী সাহেব আগেই বাইবেলের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন । ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিভাগীয় প্রধানরূপে তিনি পন্ডিত মুনসিদের দ্বারা বই লিখিয়ে মুদ্রণের ব্যবস্থা করতে লাগলেন । পুরস্কারাদি বিতরণ করে লেখকদের উৎসাহকে সজীব রাখার ব্যবস্থাও করলেন । এমনকি নিজেও প্রত্যক্ষভাবে গ্রন্থকার রূপে অবতীর্ণ হলেন । কলেজ তাঁর নিজস্ব প্রকাশিত গ্রন্থ দুটি ‘কথোপকথন’(Dialogue, ১৮০১), ‘ইতিহাসমালা’ (১৮১২)।

কথোপকথন : গ্রন্থটি ইংরেজ সিভিলিয়ানদের দেশীয় কথ্য ভাষার বিচিত্র ভঙ্গির সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর উদ্দেশ্যনিয়ে সংকলিত হয়েছে । গ্রন্থটির মোট একত্রিশটি অধ্যায় আছে । যেখানে মজুরের কথাবার্তা , ঘটকালি, হাটের বিষয় ,স্ত্রীলোকের হাট করা , মাইয়া কন্দল , জমিদার -রাইয়ত কথা প্রভৃতি সমাজের সম্ভাব্য সকল স্তরের সাধারণ লোকের কথোপকথনের উদাহরণ রয়েছে ।ফলে গ্রন্থটিতে সমকালীন সমাজের বাস্তব জীবনযাত্রার ছবি অনেকখানি ধরা পড়েছে । এর ভাষা আমাদের বিস্ময়ের সঞ্চার করে । এখানে আমরা কৃত্রিম সংস্কৃতানুগ ভাষার স্থলে যথার্থ কথ্য ভাষার স্থান রয়েছে :

> ‘‘আয় টে সকাল করে চল সূতো না বিকেলে তো নুন তেল বেসাতি পেতে হবে না । ও টে বুন সে দিন কলঘাটার হাটে গিয়াছিলাম তাহাতে দেখিয়াছি সূতার কপালে আগুন লাগিয়াছে। পোড়া কপালে তাঁতি বলে কি আটপন করে সূতাখান । সে সকল সূতা আমি এক কাহন বেচেচি বটে ।’’

‘কথোপকথন’ গ্রন্থটির প্রকৃত রচয়িতা কে সেই সম্পর্কে নানাজনের নানামত রয়েছে । তবে এর ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, গ্রন্থটির রচনার নেপথ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অবদান রয়েছে। আর আমরা একথা নিসন্দেহে বলতে পারি গ্রন্থটির পরিকল্পনা ও সম্পাদনার কাজ কেরী সাহেব নিজেই করেছেন ।

বাংলা প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহারে এই ভাষা বেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে । বাংলা গদ্যকে যোগাযোগ ও যুক্তি -চিন্তার বাহন করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গ্রন্থটির অবদান অনস্বীকার্য।বাঙালি সমাজ ও পরিবারের অনেক তথ্য এই গদ্যে উপস্থাপিত- যা সমকালীন সমাজ জীবনের প্রতিফলন ।

ইতিহাসমালা : কেরী সাহেবের দ্বিতীয় গ্রন্থ ইতিহাসমালা আসলে ইতিহাস নয় , প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সূত্র থেকে সংকলিত কতগুলি গল্পের সমষ্টি। সংকলনের আখ্যাপত্রে লেখা হয়েছে :

‘‘ A Collectionof stories in the Bengali Language collected from various sources.”

বাংলা লৌকিক কাহিনীর ভান্ডার থেকে অনেক লেখা গ্রহণ করা হয়েছিল । নিদর্শন :

‘‘ এক রাজার অতি সুন্দরী কন্যা কিন্তু সে হরিনীবদনা জন্মিয়াছিল রজা তাহাতে সদা ভাবিত কি ক্রমে বিবাহ হইবেক স্বীকার কেহ করে না এই মতে প্রায় বার তের বৎসর বয়ঃক্রম হইল ।’’

ইতিহাসমালা হলো বাংলা সাহিত্যের প্রথম গল্প সংকলন ।তবে এগুলি মৌলিক সৃষ্টি নয় । এর গল্পে মানুষের ত্যাগ তিতিক্ষার কথা যেমন আছে , তেমনি অছে কাম , ক্রোধ, লোভ, কোনো গল্পে স্ত্রীলোকের বিশ্বাসঘাতকতা, কোথাও নারীর নির্লজ্জ কামাচার , মানুষের নীচতা , খল স্বভাব , বঞ্চনা ,খুন-জখম-ডাকাতির প্রসঙ্গ। জীবজন্তুর গল্পে মানবেতর প্রাণীরা মানুষের ব্যবহার গ্রহণ করেছে ।

ইতিহাসমালার ভাষা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রাথমিক যুগের ভাষা অপেক্ষা অনেক উন্নত এবং গদ্য রচনার একটা স্টাইলও সেক্ষেত্রে লক্ষিত হয় । গল্পগুলুইর অধিকাংশই ব্যঙ্গপ্রধান , বত্রিশ সিংহাসনের টুকরো টুকরো গল্পের মতো । বাইবেল অনুবাদের অনুবাদের আড়ষ্টতা তিনি এক্ষেত্রে বর্জন করেছেন। অবশ্য কথোপকথনের সবেগ সাবলীলতা এতে নেই । তর্ক- বিতর্ক থাকলেও আমাদের তাই বলতেই হয় কেরী সাহেব এক্ষেত্রে সম্পাদক ও সঙ্কলকর্তা, লেখক নন।

প্রধানত সম্পাদক , পরিকল্পনা ও প্রেরণার উৎস হিসেবে বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের ভিত্তি স্থাপনের কেরীর অতুলনীয় দানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২- ১৮১৯)

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পন্ডিত ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার । রামমোহন -পূর্ব যুগের স্মরণীয় বাঙালিদের মধ্যে তাঁর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় । বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রকৃত স্রষ্টারূপে মৃত্যুঞ্জয়কেই সম্মান দেওয়া উচিত । ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যে পন্ডিতদের চেষ্টায় বাংলা গদ্যসাহিত্য ভিত্তি লাভ করে , মৃত্যুঞ্জয় তাঁদের মধ্যে রচিত গ্রন্থের সংখ্যাধিক্যে এবং ভাষার শিল্পরূপের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী ছিলেন । সহমরণ প্রথার বিরোধী হিসেবে তিনি যে উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন সেকালের পক্ষে তা বিস্ময়কর । তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হলো :

বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২) , হিতোপদেশ (১৮০৮) ,রাজাবলি (১৮০৮) , প্রবোধচন্দ্রিকা (আনুমানিক ১৮১৩) বেদান্তচন্দ্রিকা (১৮১৭)

প্রসঙ্গক্রমে আমরা গ্রন্থগুলির স্বল্পবিস্তর পরিচয় নেবো।

বত্রিশ সিংহাসন : গ্রন্থটি আখ্যায়িকাধর্মী রচনা । কেরীর নির্দেশে মৃত্যুঞ্জয় ‘সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা’ অবলম্বনে ‘বত্রিশ সিংহাসন’ রচনা করেন । এটি ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয় । গল্পরসের আকর্ষণে এই গ্রন্থের অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ।গল্পের মূলে আছে ইতিহাস ও জনশ্রুতি। আদর্শ রাজা বিক্রমাদিত্যের চরিতকথা , ঔদার্য ও মহানুভবতা বর্ণনা এই বত্রিশটি গল্পের উদ্দেশ্য । রাজা বিক্রমাদিত্যের নির্লোভ, নিঃস্বার্থ, পরোপকারী চরিত্র বর্ণনার জন্য গল্পগুলি রচিত হয়েছিল । তাঁর এই গ্রন্থ সংস্কৃত আখ্যানগ্রন্থের অনুসারী ছিল।

গ্রন্থটিতে গদ্যরীতির স্বচ্ছতা , শব্দচয়নের মধ্যে ভাব অনুযায়ী ভাষা পরিকল্পনা , বিবৃতিধর্মী সরল কথকতা লক্ষ্য করা যায় ।যা অনেকটাই স্বতঃস্ফূর্ত ও রসাশ্রিত । সবশেষে বলা যায় গদ্য সাহিত্যের উষালগ্নে গন্থটিতে যে সমাজজীবনের ছবি ধরা পরেছে তা এককথায় অনবদ্য ।

হিতোপদেশ : এটি একটি অনুবাদ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে গোলোকনাথ শর্মার হিতোপদেশ প্রকাশিত হলেও কেরী মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রন্থকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন । পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলিকে লেখক অনুবাদ করেছেন । বিদেশীদের কাছেও গ্রন্থটি সমাদৃত । এর কাহিনীগুলি বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক । পশুপাখির মুখে অবিকল মানুষের ভাষা বসিয়েছেন তিনি । কোথাও রঙ্গকৌতুক , কোথাও উপদেশ , কোথাও বা নিছক বর্ণনা গ্রন্থটিকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে । তবে হিতোপদেশের কোথাও কোথাও আদিরস ও অশ্লীলতা স্থান পেয়েছে ।

রাজাবলি: এর বিষয়বস্তু হুবহু কোনো বই থেকে অনূদিত নয় । নানা স্থান থেকে সংগৃহীত। কলির আরম্ভ থেকে ইংরেজ -অধিকার পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটদের কথা তিনি এই বইয়ে বলেছেন । ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলনের এই প্রথম প্রচেষ্টা লক্ষ্য করবার মতো ।

প্রবোধচন্দ্রিকা :নানা শাস্ত্রকথা , নীতিকথা , ব্যাকরণ , অলঙ্কার , ছন্দ প্রভৃতি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে নানা গালগল্প , রূপকথা সঙ্কলিত হয়েছে । এদের কিছু কিছু অন্য বই থেকে সংগৃহীত । কিন্তু পরিকল্পনা , গ্রন্থনা ও মৃত্যুঞ্জয়ের নিজস্ব । বইটি দীর্ঘকাল পাঠ্যপুস্তকরূপে সেকালের নানা বিদ্যালয়ে সমাদৃত হয়েছে ।

বেদান্তচন্দ্রিকা : রামমোহনের বেদান্তগ্রন্থের প্রতিবাদ । মৃতুঞ্জয় দার্শনিক জ্ঞান , গভীর মনীষা ও বিতর্ক-কুশলতার সুন্দর নিদর্শন এই রচনা ।

মৃত্যুঞ্জয় কথ্য ভাষা ও পন্ডিতী গদ্যের ব্যবহারে বিশেষভাবে পারদশী ছিলেন । নমুনাস্বরূপ তাঁর দুই ধরণের ব্যবহৃত ভাষাকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

''মোরা চাষ করিব ফসল পাবো , রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকেতাহাতেই বছর শুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো,
ছেলেপিলাগুনি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয় ,সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি ,
কেবল উড়ি ধানের মুড়ী ও মটর মসুর শাক পাত শামুখ গুগলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি।'' (কথ্য ভাষা)

''যে সিংহাসনে কোটি কোটি লক্ষ স্বর্ণদাতারা বসিতেন সেই সিংহাসনের মুষ্টিমাত্র ভিক্ষার্থী অনায়াসে বসিল ।
যে সিংহাসনে বিবিধ প্রকার রত্নালঙ্কারধারিরাবসিতেন সে সিংহাসনে ভস্মবিভূষিতসর্বাঙ্গ কুযোগী বসিল ।
যে সিংহাসনে অমূল্য কিরীটধারী রাজারা বসিতেন সেই সিংহাসনে জটাধারী বসিল ।(পন্ডিতী ভাষা)

এই উভয় রীতির ভাষাই যে পাকা হাতের লেখা - দুর্বল কলমের কম্পন যে এদের মধ্যে কোথাও নেই একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় । তাই বলা যায় বাংলা গদ্যরীতির রাজপথটি মৃত্যুঞ্জয় থেকে শুরু হয়ে বিদ্যাসাগরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে ।

রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩)

রামরাম বসু দীর্ঘকাল ইংরেজ মিশনারীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে কেরী সাহেবের বংলা শিক্ষক এবং মুনসী হিসেবে তিনি শ্রীরামপুর মিশনে বেশ কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন । মিশন -প্রচারিত গ্রন্থাবলীর অনুবাদ , রচনা ও সম্পাদনায় তাঁর কিছু ভূমিকা থাকা সম্ভব। অবশেষে তাঁর সাক্ষাৎ পাই ফোর্ট

উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক হিসেবে । কেরীর উৎসাহে তিনি বাংলা ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়নে অগ্রসর হলেন । তাঁর ‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ ১৮০১ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় । এটিই বঙ্গাক্ষরে বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রথম মুদ্রিত মৌলিক গ্রন্থ। তবে এই ঘটনাটি যতটা আকস্মিক ততটা তাৎপর্যবহ নয় । তাঁর বই প্রথম মুদ্রিত হলেও তাঁকে শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক বলার অবকাশ নেই ।বরং কলেজের প্রধান তিনজন গ্রন্থকারের মধ্যে রামরাম বসুর ভূমিকা সর্বাপেক্ষা ত্রুটিপূর্ণ। বাংলা গদ্যরীতির মুক্তির পথটি তিনি খুঁজে পাননি ।

‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ গ্রন্থটির বিষয়বস্তু নানা ফারসি গ্রন্থ এবং কিংবদন্তী থেকে সঙ্কলিত । এ গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস বলার চেষ্টা হয়েছে , বিষয়বস্তু গালগল্প রচনার যুগে বিষয় কিঞ্চিৎ অভিনব সন্দেহ নেই। সেকালে ঐতিহাসিক নিষ্ঠা ও দৃষ্টিভঙ্গি বা তথ্য সব কিছুই ছিল দুর্লভ। ‘লিপিমালা ’ (১৮০২) নানা বিষয়ে লেখা চিঠির সঙ্কলন । পত্রের আকারে নানা পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীও বিবৃত হয়েছে । চৈতন্যদেবের জীবনকথাও পাওয়া যায় ।কিন্তু ফারসি পদ্ধতিতে শিক্ষিত মুনসী রামরাম বাংলা ভাষার স্বাভাবিকত্ব ফারসি শব্দের বাহুল্যে অনেকটা নষ্ট করেছেন ।